



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- III, Issue-I, September, 2026, Page No. 01-16

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.3.issue.01W.499



বাল্মীকি রামায়ণের নব রূপায়ণে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব: প্রসঙ্গ 'শ্রীরামবিজয় নাট'
রীতা রানী দে, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই,
অসম, ভারত

Received: 11.09.2026; Accepted: 20.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

The Ramayana is a foundational epic from which numerous literary works, poems, essays, novels and many other forms of literature have been created in a new and diverse ways. Mahapurusha Srimanta Sankardeva was also one such literary figures who drew upon the Ramayana and composed his celebrated play 'Shriramavijaya Nat'. The plot of this drama is taken from the Balakanda of Valmiki's Ramayana.

Lord Shri Ramachandra incarnated Himself for the destruction of evil and the protection of the righteous. In the play, we see that the young Shri Ramachandra protected the sacrificial site of the sage Vishwamitra from the disturbances caused by the wicked demons. Again, after breaking the mighty bow of Lord Shiva (Haradhanu) and winning Sita as his wife, Shri Ramachandra was returning home when Parashurama, eager to engage him in a battle, confronted him. In order to fulfil Parashurama's desire for combat, Ramachandra prepared an arrow to place upon the bow. Moreover, Srimanta Sankardeva has left the imprint of his extraordinary talent in the portrayal of characters such as Dasharatha, Vishwamitra etc. These aspects demand separate and detailed discussion. Therefore, it has been decided to prepare a research paper entitled "Mahapurusha Srimanta Sankardeva in the Reinterpretation of Valmiki's Ramayana: With Special Reference to 'Shriramvijaya Nat'."

Keywords: Assamese, Bengali, Valmiki, Ramayana, Srimanta Sankardeva

রামায়ণ হল এমন একটি আকরগ্রন্থ, যার থেকে অনেক গ্রন্থ, প্রবন্ধ, কাব্য-কবিতা— ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিকে, নিত্য-নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করে সাহিত্যিকদের হাতে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণার উৎসস্বরূপ রামায়ণকে তুলে দিয়েছিলেন, সেই আদি যুগে; এবং সেই যুগ থেকে রামায়ণ তার এই দায়িত্ব যেন অলিখিত নিয়মে অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে। যুগ যুগ ধরে প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরা তাঁদের সাহিত্যের উপকরণ গ্রহণ করেছেন এই রামায়ণ গ্রন্থ থেকে। রামায়ণের কাহিনিকে কেন্দ্র করে বর্তমান পর্যন্ত অগণিত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবও (১৪৪৯-১৫৬৮) এমনই একজন সাহিত্যিক, যিনি রামায়ণ থেকে উপকরণ গ্রহণ করে সেই উপকরণকে নতুনভাবে তাঁর সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন। আসামের নগাঁও জেলায় তিনি

জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মকে নববৈষ্ণব ধর্ম বলা হয়। তিনি একশরণ ভাগবতী বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের মনকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলার জন্য তিনি সংস্কৃত মূল ভাগবতের অসমিয়া ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি সংস্কৃত পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি,— যেখানে শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল মহিমা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে— সেই বিষয়গুলিকে নতুন রূপে উপস্থাপন করেছিলেন। একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি রচনা করেছিলেন— 'কালিয়দমন নাট' (১৫১৮), 'পারিজাতহরণ নাট', 'রুক্মিণীহরণ নাট', 'কেলিগোপাল নাট' (১৫৪০), 'শ্রীরামবিজয় নাট' (১৫৬৮) নামক তাঁর বিখ্যাত 'অঙ্কীয়া নাটক'গুলি। হিন্দুধর্মের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র দুজন হলেন ভগবান নারায়ণের অবতার। তাঁরা দুজনের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য অবতার রূপ গ্রহণ করেছিলেন। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব রচিত এই নাটকেও এই বিশ্বাস রয়েছে।

নববৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের জন্য মানুষের মনে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিভাব বৃদ্ধি করার জন্য শ্রীমন্ত শঙ্করদেব তাঁর 'শ্রীরামবিজয় নাট' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। নারায়ণের অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি তাঁর এই নাটকের নায়ক করেছেন। রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ঘটনা মানুষের মনকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব শুধুমাত্র সেই সমস্ত ঘটনাগুলো বেছে নিয়ে তাঁর এই নাটকের কাহিনি রচনা করেছেন। রামায়ণের কাহিনিকে তিনি নিজের প্রয়োজন এবং পছন্দ মতে নতুন করে নাটকে উপস্থাপন করেছেন। ষোড়শ শতকে রচিত হলেও শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের প্রতিভার গুণে নাটকটি একটি উন্নতমানের নাটক হয়ে উঠেছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

- ক) মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ড থেকে উপকরণ নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে 'শ্রীরামবিজয় নাট' গ্রন্থের কাহিনি নির্মাণ করেছেন। রামায়ণের কাহিনিকে নাটকে তিনি নতুনরূপে উপস্থাপন করেছেন।
- খ) শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের 'শ্রীরামবিজয় নাট' গ্রন্থে শ্রীরামচন্দ্র, ঋষি বিশ্বামিত্র, সীতা, রাজা দশরথ, পরশুরাম— প্রভৃতিদের নবরূপায়ন হয়েছে। তাঁরা ছাড়াও নাটকে এসেছে কিছু কাল্পনিক চরিত্র। যেমন,— সীতার সখিরা প্রভৃতি।
- গ) শ্রীমন্ত শঙ্করদেব নববৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলম ধরেছিলেন। নারায়ণের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের যে সমস্ত কীর্তি মানুষের মনকে ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট করবে, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব শ্রীরামচন্দ্রের সে সমস্ত কীর্তি নাটকে খুব আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেছেন।
- ঘ) 'শ্রীরামবিজয় নাট' গ্রন্থে অবলম্বনে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মহাপুরুষ শঙ্করদেবের নাট্য প্রতিভার বিস্তারিত আলোচনা করা ; তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ নাটককার।

— ইত্যাদি বিষয়গুলি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে, তাই “বাল্মীকি রামায়ণের নব রূপায়ণে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব: প্রসঙ্গ 'শ্রীরামবিজয় নাট'” শীর্ষক গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সাহিত্যিক প্রকাশনা: মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব এবং তাঁর অসাধারণ সাহিত্য ভাণ্ডার সম্পর্কে বহু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন, অনুরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পূর্ব ভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য’, দিগ্বেশ্বর নেওগের ‘যুগনায়ক শঙ্করদেব’, বিমল মজুমদারের ‘শঙ্করদেব চর্চা’ ইত্যাদি। তবে, মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের ‘শ্রীরামবিজয় নাট’ গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা চোখে পড়েনি, তাই আলোচ্য গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

পদ্ধতি: আকর গ্রন্থ এবং সহায়ক গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ততথ্য বিচার করে বর্ণনামূলক পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আলোচ্য গবেষণা পত্রে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কাজ সম্পূর্ণ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ:

শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বিরচিত 'শ্রীরামবিজয় নাট' গ্রন্থের কাহিনি: শ্রীমন্ত শঙ্করদেব 'শ্রীরামবিজয় নাট' গ্রন্থের কাহিনি বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ড বা বালকাণ্ড থেকে গ্রহণ করেছেন। তিনি আদিকাণ্ডের 'একোনবিংশঃ সর্গঃ' থেকে 'সপ্তসপ্ততিতমঃ সর্গঃ' পর্যন্ত কাহিনিভাগ অবলম্বন করে তাঁর বিখ্যাত 'শ্রীরামবিজয় নাট' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তবে, বত্রিশ সংখ্যক সর্গ থেকে চৌষটি সংখ্যক সর্গ পর্যন্ত তিনি বর্জন করেছেন। নাটকে দেখা যায়, ঋষি বিশ্বামিত্র মারীচ এবং সুবাহু নামক দুই রাক্ষসের উপদ্রবের জন্য যজ্ঞ সম্পন্ন করতে বাধা পাচ্ছিলেন। তাই তিনি মহারাজ দশরথের রাজসভায় এসে তাঁর দুই পুত্র রাম এবং লক্ষ্মণকে যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন। পিতা দশরথ তাঁর বালক পুত্রদের মারীচ এবং সুবাহুর মত শক্তিশালী রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধে পাঠাতে চাননি। ঋষি বিশ্বামিত্রের সমস্যা সমাধান করার জন্য তিনি নিজেই তাঁর সঙ্গে যেতে চান। ঋষি বিশ্বামিত্র তাতে খুব ক্রোধিত হন। তিনি নারায়ণের অবতার রামচন্দ্রের অনন্ত মহিমার কথা রাজা দশরথকে বলেন। আবার রামচন্দ্রের অবতার গ্রহণের উদ্দেশ্যই যে হল, দুষ্টির দমন করা— একথারও বর্ণনা করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত প্রায় বাধ্য হয়েই রাজা দশরথ তাঁর পুত্রদের ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাঁর যজ্ঞস্থল রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পাঠান। পথে শ্রীরামচন্দ্র দুষ্ট তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেছেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে পৌঁছে তিনি দুষ্ট রাক্ষসদের উৎপাতের হাত থেকে ঋষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞস্থলকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে মিথিলায় গিয়ে প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং প্রত্যাহবান জয় করে মহারাজা জনকের তৈরি স্বয়ম্বর সভায় 'মহেশক ধনু'তে গুণ দিয়ে পত্নী সীতাকে জয় করেছিলেন বালক শ্রীরামচন্দ্র। বিবাহের পর পত্নী সীতাকে নিয়ে ঘরে ফেরার পথে যুদ্ধে আগ্রহী পরশুরামের ইচ্ছা পূরণের হেতু ধনুকে শর প্রস্তুত করেন এবং আবার তাঁরই প্রার্থনা অনুসারে তাঁকে প্রাণ ভিক্ষা দেন। মাতা কৌশল্যা পুত্র এবং পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে তোলেন। এখানেই নাটকের কাহিনি সমাপ্ত হয়েছে।

বাল্মীকি রামায়ণের কাহিনি: বাল্মীকি রামায়ণে আছে, পৌলস্ত্যবংশের রাক্ষস রাবণ, মারীচ এবং সুবাহু নামক রাক্ষসদের ঋষি-মুনিদের যজ্ঞ বিনাশ করার জন্য পাঠাতেন।^১ তাই, তারা ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে এসে তাঁর যজ্ঞ পণ্ড করছিল।^২ ঋষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছে এসেছিলেন, তাঁর পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে দশ দিনের জন্য সিদ্ধাশ্রমে নিয়ে যেতে। তিনি চেয়েছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের হাতে রাক্ষসদের বিনাশ করে নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করতে।^৩ রামচন্দ্র পনেরো বছরের বালক।^৪ বালক রামচন্দ্র এখনও ধনুর্বিদ্যায় বিশারদ হয়ে উঠেননি, শত্রুদের শক্তি বোঝার ক্ষমতা এখনও তাঁর হয়ে উঠেনি,— ইত্যাদি কারণে প্রথমে রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে ঋষি বিশ্বামিত্রের সাথে পাঠাতে চাননি।^৫ রামচন্দ্রের স্থানে তিনি নিজেই রাক্ষসদের দমন করার জন্য ঋষি বিশ্বামিত্রের সাথে যেতে চেয়েছেন।^৬ রাজা দশরথ কিছুতেই তাঁর পুত্র রামকে বিশ্বামিত্রের সাথে যেতে দিতে চাইছেন না দেখে, ঋষি বিশ্বামিত্র খুব ক্রোধিত হন।^৭ ঋষি বশিষ্ঠের কথায় রাজা দশরথ পুত্র রামকে বিশ্বামিত্রের সাথে পাঠাতে রাজি হয়েছিলেন।^৮ শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে আশ্রমে আসার পথে ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁদের 'বলা' ও 'অতিবলা' নামক বিদ্যাদান।^৯ এছাড়াও তিনি তাঁদের কন্দর্পদেব, তাড়কা রাক্ষসী প্রভৃতি উপাখ্যান শুনিয়েছেন। মলদ ও করুণ জনপদে সুন্দ দৈত্যের পত্নী দুষ্ট তাড়কার বাস। সে জনপদদুটির সমস্ত কিছু নষ্ট করে একটা ভয়াবহ আতঙ্ক তৈরি করে রেখেছে। কেউ-ই তার ভয়ে সেখানে যেতে পারে না।^{১০}

ঋষি বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় শ্রীরামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেছেন।^{১১} তাড়কা বধের পর ঋষি বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি খুব খুশি হয়ে তাঁকে অনেকগুলো অস্ত্র প্রদান করেন। শ্রীরামচন্দ্র বিনয় এবং শ্রদ্ধা সহকারে সেই দিব্য অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করেন।^{১২} তাড়কার জনপদ ত্যাগ করে পথ চলতে চলতে দূর থেকে একটি মনোরম স্থান দর্শন করে শ্রীরামচন্দ্র সেই স্থান সম্পর্কে ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছে জানতে চান।^{১৩} পথ চলতে চলতে শ্রীরামচন্দ্রের আগ্রহে ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁকে সিদ্ধাশ্রম সম্পর্কে অনেক কথা এবং কাহিনি তাঁকে শোনান। এই যাত্রায় তাঁদের সঙ্গে লক্ষ্মণও ছিলেন। তাঁরা সিদ্ধাশ্রমে পৌঁছলে আশ্রমবাসীরা তাঁদের আদর-সৎকার করেন।^{১৪} এবারে ঋষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করার দায়িত্ব নিলেন শ্রীরামচন্দ্র এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণকে। দুজনে মিলে রাক্ষসদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে রাক্ষসেরা যজ্ঞ ভঙ্গ করার কাজে লেগে যায়। শুরু হল রাক্ষস বিনাশ পর্ব। শ্রীরামচন্দ্র মারীচের বক্ষে মানববাণ নিক্ষেপ করলেন। আহত মারীচের সমুদ্রগর্ভে পতন ঘটে।^{১৫} সুবাহ রাক্ষসকেও একই ভাবে শ্রীরামচন্দ্র শর নিক্ষেপ করলেন।^{১৬} নির্বিঘ্নে ঋষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ সমাপন হয়। সিদ্ধাশ্রমের কয়েকজন ঋষি বিশ্বামিত্র এবং শ্রীরামচন্দ্রকে জানিয়েছেন যে, মিথিলায় জনক রাজার রাজ্যে একটি ধর্মময় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হবে। তাঁরা সেইখানেই যাচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রও যেতে পারবেন। তাছাড়া সেখানে একটি বিস্ময়জনক ধনুক আছে, শ্রীরামচন্দ্র সেই ধনুকটির দর্শনও করতে পারবেন।^{১৭} পরবর্তীতে দেখা যায়, ঋষি বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় রাজা জনকের যজ্ঞস্থলে এসেছেন, তাই মিথিলার রাজা জনক খুব খুশি হয়েছেন।^{১৮} রাজা জনকের কাছে যে অভূতপূর্ব ধনুক রয়েছে, সেই ধনুক দর্শন করে শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ চলে যাবেন।^{১৯} রাজা জনক ঋষি বিশ্বামিত্রকে বলেছেন যে,— তিনি ক্ষেত্রভূমিতে সীতাকে পেয়েছিলেন। সেই থেকে সীতা তাঁর কাছে বড় হচ্ছেন। উপযুক্ত বয়স হওয়ার পর সীতাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত বীর খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তিনি। খাঁটি বীরত্বের পরীক্ষা করার জন্য তিনি সেই পুরুষদের শৈব ধনু এগিয়ে দিয়েছিলেন। তারা সেই ধনুটিকে হাত দিতে তুলতে পারেনি। রাজা জনক তাদের সবাইকে প্রত্যাখ্যান করে দেন। সেই রাজারা ক্রোধিত হয়ে মিথিলা অবরোধ করেন। বছর পূর্ণ হতে না হতে রাজা জনকের সৈন্যসামন্ত অস্ত্র ভাণ্ডার শেষ হয়ে এলে তিনি খুব দুঃখিত হয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে তপস্যা শুরু করেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবতারা তাঁকে চতুরঙ্গ সেনা প্রদান করেন। সেই চতুরঙ্গ সেনার সাহায্যে তিনি মিথিলা নগরীকে শত্রুমুক্ত করতে সক্ষম হন। সেই ধনুটিই তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থাপন করবেন। শ্রীরামচন্দ্র যদি সেই ধনুকে গুণযোজনা করতে পারেন, তবে তিনি তাঁর কন্যা সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে অর্পণ করবেন।^{২০} গুণযোজনা করে শরসন্ধান করতে গিয়ে শ্রীরামচন্দ্র সেই ধনুকটির একেবারে মাঝখানেই ভেঙে ফেলেন।^{২১} অযোধ্যায় দূত প্রেরণ করে দূতের মাধ্যমে রাজা জনক এই পুরো ঘটনাটি রাজা দশরথকে জানান এবং এই বিয়ের ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করেন।^{২২} রাজা দশরথও সময় নষ্ট না করে আত্মীয়-পরিজন-গুরুজন, চতুরঙ্গ সেনা সবাইকে নিয়ে চারদিনে মিথিলায় এসে পৌঁছেন।^{২৩} শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথ এবং তাঁর পরিবারের গুরুজনদের উপস্থিতিতে পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে পিতা জনক তাঁর কন্যা সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে অর্পণ করলেন। একই বিবাহ অনুষ্ঠানে শ্রীরামচন্দ্রের অপর আরও তিন ভাই লক্ষ্মণ, ভরত এবং শত্রুঘ্নেরও বিবাহ হয়েছিল।^{২৪} শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ভাইদের বিয়ের পর ঋষি বিশ্বামিত্র উত্তর পর্বতের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।^{২৫} আত্মীয় পরিজন এবং পত্নীদের নিয়ে অযোধ্যায় ফেরার পথে ঋষি পরশুরাম বিষুণুপ্রদত্ত বৈষ্ণবধনু নিয়ে হরধনু ভঙ্গকারী শ্রীরামচন্দ্রের পথ অবরোধ করেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে বলেন যে, যদি শ্রীরামচন্দ্র সেই বৈষ্ণবধনুতে বাণ যোজনা করতে পারেন, তবে তিনি শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করার সুযোগ দেবেন।^{২৬} শ্রীরামচন্দ্র সেই ধনু গ্রহণ করেন এবং সেই ধনুতে শরসন্ধান করে ঋষি পরশুরামের সমস্ত বল

নাশ করে দেন। ঋষি পরশুরাম স্বীকার করেন, শ্রীরামচন্দ্রই হলেন অবিনাশী মধুসূদন।^{২৭} ঋষি পরশুরামের ইচ্ছাতে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তাঁর তপস্যার ফলে অর্জিত সমস্ত দিব্যালোকের নাশ দেখতে পেয়ে তিনি মহেন্দ্র পর্বতে চলে যান।^{২৮} ঋষি পরশুরাম চলে যাওয়ার পর আবার তাঁরা অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা হন। অযোধ্যায় পৌঁছানোর পর মাতা কৌশল্যা, মাতা কৈকেয়ী এবং মাতা সুমিত্রা পুত্র এবং পুত্রবধূদের বরণ করেন^{২৯} বাল্মীকি রামায়ণের আদিকাণ্ডের এই অংশ থেকে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব তাঁর ‘শ্রীরামবিজয় নাট’ গ্রন্থের উপকরণ গ্রহণ করেছেন।

চরিত্র: নাটকের কাহিনি প্রধানত শ্রীরামচন্দ্র, ঋষি বিশ্বামিত্র এবং সীতাকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে। তাঁরা ছাড়া নাটকে রয়েছেন,— রাজা দশরথ, পরশুরাম, লক্ষ্মণ, সীতার সখি— প্রভৃতি। এই চরিত্রগুলোর বেশির ভাগ চরিত্রই রামায়ণ থেকে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের ‘শ্রীরামবিজয় নাট’ গ্রন্থে স্থান পেয়েছেন। আবার কয়েকটি চরিত্র অবশ্য কাল্পনিক। এই দুই ধরনের চরিত্র সৃষ্টিতেই শ্রীমন্ত শঙ্করদেব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীরামচন্দ্র: নাটকে শ্রীরামচন্দ্র হলেন, নারায়ণের অবতার। তিনি ধরার ভার হরণ করার জন্য রাজা দশরথের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তবে, তিনি সাধারণ মানুষ নন। তিনি ঈশ্বর। নাটকের শুরুতেই এই সম্পর্কে সূত্র বলেছে,

“যে জগতক পরম ঈশ্বর নারায়ণ ভূমিক ভার হরণ নিমিত্ত দশরথ গৃহে অবতরল সোহি
ভগবন্ত শ্রীরামরূপে ওহি সভামধ্যে প্রবেশ কয়কহু সীতা বিবাহ বিহার নৃত্য পরম কৌতুকে
করব, ...।”^{৩০}

তবে, মানবাবতার গ্রহণ করে তিনি সমস্ত সামাজিক রীতি-নীতি, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি পালন করেছেন। পিতার আজ্ঞা তাঁর কাছে খুব মূল্যবান। নাটকে দেখা যায়, যখন সিদ্ধাশ্রম নিবাসী ঋষি বিশ্বামিত্র মারীচ এবং সুবাহু নামক দুজন রাক্ষসের অত্যাচারের হাত থেকে যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য রাজা দশরথের কাছ থেকে শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে তাঁর সিদ্ধাশ্রমে নিয়ে যেতে চান, তখন রাজা দশরথ প্রথমে তাঁর আদরের বালক পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠাতে চাননি। পরে ঋষি বিশ্বামিত্রের বার বার করে শ্রীরামচন্দ্রের অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলার পর, তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাঁদের পাঠাতে রাজি হন। পিতার অনুমতি পাওয়ার পর শ্রীরামচন্দ্র ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাঁর আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রথমে তিনি তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন। তারপর আবার প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে তিনি তাঁর ধনুকে শরসন্ধান করে সুবাহুকে সাগরে প্রেরণ করেছেন এবং মারীচকে সিদ্ধাশ্রমের যজ্ঞস্থল থেকে জ্যান্ত অবস্থায় লঙ্কায় ফেলে দিয়েছেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদে ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পেরেছেন। যজ্ঞ সম্পন্ন করার পর তিনি শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলায় রাজা জনকের কন্যা সীতার বিয়ের জন্য আয়োজিত স্বয়ম্বর সভায় গমন করেন। তিনি আগেই শ্রীরামচন্দ্রকে ‘মহেশক ধনু’তে গুণ দিয়ে সুন্দরী সীতাকে জয় করা যাবে, এই কথা শ্রীরামচন্দ্রকে বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, এই সীতা পূর্ব জন্মে তপস্যা করে প্রভু নারায়ণের অবতারকে স্বামী হিসেবে পেয়েছিলেন। এই জন্মেও তিনি নারায়ণের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান করেই দিন কাটাচ্ছেন।^{৩১} ভগবান বা ঈশ্বরকে স্বামী হিসেবে পেতে চাইলে নারীদের দীর্ঘ তপস্যা করতে হয়। এমন অন্যত্রও দেখা যায়। যেমন, ‘শিবপুরাণে’ আছে, দীর্ঘ তপস্যা করে মাতা পার্বতী বাবা বিশ্বনাথকে স্বামী হিসেবে লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।^{৩২} ঋষি বিশ্বামিত্রের কথা শুনে শ্রীরামচন্দ্রের মনে সীতাকে লাভ করার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু পর মুহূর্তেই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, তিনি সেই ধনুতে গুণ দিতে পারবেন কিনা। এই সম্পর্কে তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রকে বলেছেন,

“আহে মুনিরাজ! হামু বালক, ওহি ধনু বজ্রাধিক কঠিন। ইহাতে গুণ দিতে হামার সামর্থ্য কৈচন হোই। তথাপি আঙা পালি যত্ন করব। যে ধনুত গুণ দিতে মহারাজাসব নাহি পারল, ইহাত হামার কোন লাজ নাহি।”^{৩৩}

বুঝতে পারা যায়, শুধুমাত্র ঋষি বিশ্বামিত্রের আঙা পালন করার জন্যই তিনি সেই ধনুতে গুণ লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। সূত্রের মুখে নাট্যকার নাটকে জানিয়েছেন, শ্রীরামচন্দ্র সেই ধনুতে গুণ দিতে পেরেছেন এবং যে মুহূর্তে তিনি ধনুতে টঙ্কার দিয়েছেন সেই মুহূর্তে ধনুকটির ঠিক মাঝখানেই ভেঙে যায়।^{৩৪} শ্রীরামচন্দ্র সেই ‘মহেশক ধনু’তে গুণ দিয়ে সুন্দরী সীতাকে জয় করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেই স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত অন্যান্য রাজারা যারা সেই ধনুকে গুণ দিতে সক্ষম হয়নি, তারা শ্রীরামচন্দ্রের সেই সভায় আন্দোলন করার জন্য প্রস্তুত হয়। সীতাও এই বিষয়ে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। সেই মুহূর্তে শ্রীরামচন্দ্র পত্নী সীতাকে প্রবোধ দিয়ে বলেন,

“হে প্রাণপ্রিয়ে, তুহু কাহেক ভয় করহ। ওহি রাজাসব হামাক আণ্ড কোন হয়। যৈচে সিংহক আণ্ড বালেক হরিণ। হামাক বাণ প্রহাৰে এইক্ষণে পলাবব। তুহু আজু কৌতুকে দেখহ।”^{৩৫}

সীতাকে আশ্বাস দিয়ে শ্রীরামচন্দ্র এই কথাগুলো বলেছিলেন। এখানে প্রবল আত্মবিশ্বাসী শ্রীরামচন্দ্রকে দেখা যায়। তিনি প্রয়োজনে নিজেকে এবং তাঁর স্ত্রীকে বিপদের মুহূর্তে রক্ষা করতে জানেন। এখানে তিনি তাঁর স্ত্রীর ভরসা অর্জন করতে পেরেছেন। তিনি সমস্ত বিরোধী রাজাদের সম্বোধন করে বলেছেন,

“অয়ে পাপী রাজাসব। হামু ধনুভঙ্গ কয় জানেকী পাবল। কি নিমিত্ত ইয়াত বিপক্ষ আচরহ। যত শকতি থিক হামাক সমর করহ।”^{৩৬}

এই কথাগুলো থেকে ন্যায়পরায়ণ, সত্যের পূজারী, সাহসী শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বয়সে বালক হলেও তিনি দুর্বল অথবা ভীতু নন। তিনি সেই রাজাদের ন্যায়ের পথে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। আবার তিনি এখানে তাদের ‘পাপী’ বলেছেন। অর্থাৎ ইচ্ছে করলে তাঁরা প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শরণে আসতে পারে; ---এই ইঙ্গিতও যেন তিনি তাদের দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র হরিভক্তি ছিল না। তাই, তারা শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে না। তারা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তৎপর হয়ে উঠে। তারা শ্রীরামচন্দ্রকে লক্ষ করে একসঙ্গে অনেকগুলো বাণ নিক্ষেপ করে। শ্রীরামচন্দ্র সেই সমস্ত বাণকে নষ্ট করে দেন। তিনি বাণ নিক্ষেপ করে তাদের কারো কান কেটে দেন, কারো পা কেটে দেন। আবার কারো হৃদয় ভেদ করে দেন। ভয়ে সেই রাজারা যুদ্ধ ভূমি ত্যাগ করে পালিয়ে যান।-- শ্রীরামচন্দ্রের এই যুদ্ধ জয়ের কাহিনি সূত্র নাটকে বলেছে।

শ্রীরামচন্দ্রের এই বীরত্ব দেখে রাজা জনক খুব আনন্দিত হন। তিনি দূত পাঠিয়ে রাজা দশরথকে মিথিলায় নিয়ে আসেন। নিয়মানুসারে শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতার বিয়ে দিয়ে সঙ্গে তিনি যতটা পেরেছেন, যৌতুক দিয়ে তাঁর আদরের কন্যা সীতাকে রাজা দশরথ এবং স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি রওনা করে দিয়েছেন। পথে তাঁদের জন্য অন্য এক বিপদ অপেক্ষা করছিল। হরধনু ভঙ্গ হয়ে গিয়েছে, জানতে পেরে কুঠার কাঁধে নিয়ে পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের পথরোধ করে দাঁড়ান। পিতা দশরথ তাঁর বালক পুত্রের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও পরশুরামের রাগ হ্রাস পায় না। ভয়ে সীতাও বিধিকে স্মরণ করে বিলাপ করতে শুরু করেন। শ্রীরামচন্দ্র আবার তাঁর স্ত্রীকে সাহুনা দিয়ে বলেছেন,

“হে প্রিয়ে! ওহি বনবাসী ঋষিক দর্প দেখিয়ে তোহারি তরাস মিলল। ওহি হামাক আণ্ড কোন পতঙ্গ। দেখু, এহি ক্ষণে দুষ্ট দ্বিজক দর্প চূর্ণ করব। হে প্রাণ প্রিয়ে! আজু কৌতুকে দেখহ ঋষিক মুণ্ড মুণ্ডহো।”^{৩৭}

এখানে একদিকে তিনি সীতার যোগ্য স্বামী অপরদিকে দর্পহরণকারী নারায়ণ। এই ঘটনাটি শ্রীরামচন্দ্রের লীলারই একটা অঙ্গ, একথা বোঝানোর জন্য শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে কৌতুক দেখার জন্য বলেছেন। নাটকে দেখা যায়, এই সময় ঋষি বিশ্বামিত্রও শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে রয়েছেন। তিনিও পরশুরামের দর্প চূর্ণ করতে চেয়েছেন। বলা বাহুল্য, মূল রামায়ণে এই সময় ঋষি বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে ছিলেন না। ভ্রাতা লক্ষ্মণও পরশুরামকে বধ করার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে বলেন যে, লক্ষ্মণ এখনো বালক। এই যুদ্ধ শ্রীরামচন্দ্র একাই করবেন। ভ্রাতা লক্ষ্মণ এই যুদ্ধের দর্শক হয়ে থাক। তিনি পরশুরামকে বলেছেন,

“অয়ে দুষ্ট দ্বিজাধম! ক্ষত্রিয় সব মারি তুহু গরব কৰৈচ। তোহার মাতা ষেণুকাক কাটি পাপ আচরল। সোহি কথা কহিয়া কি হামাক ভিতি দেখাব। বহ রহ, আজু তুহু যমপুর দেখব। যত শকতি থিক হামাক সমুখ ছয়া রহ।”^{৩৮}

তিনি পরশুরামকে বুঝিয়ে দিয়েছেন মাতৃহত্যাকারী সব সময় পাপীই হয়। তাঁর গৌরব করা সাজে না। এবার তাঁকে শ্রীরামচন্দ্রই যমালয়ে পাঠাবেন। অর্থাৎ ধরাধামে বেঁচে থাকার সময়সীমা তাঁর ফুরিয়ে গেছে। যে মুহূর্তে শ্রীরামচন্দ্র তাঁর ধনুকে টঙ্কার করলেন, সেই মুহূর্তেই পরশুরাম হাতের কুঠার ফেলে দিয়ে সেই স্থান থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। নাটকে সূত্রের মাধ্যমে জানা যায়, শ্রীরামচন্দ্র তাঁর পেছনে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ধরে আনেন। এবার তিনি ভয়ে কাঁপতে থাকেন। তিনি স্বীকার করেন যে,— শ্রীরামচন্দ্র হলেন, ঈশ্বর এবং তিনি হলেন তাঁর অংশ। না বুঝে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি দর্প প্রকাশ করেছেন। পরশুরামের অনুরোধে শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে প্রাণদান করেন। কিন্তু যে বাণ তিনি পরশুরামকে দণ্ড দেওয়ার জন্য তাঁর ধনুকে সাজিয়েছিলেন সেই বাণ তিনি ফেরত পাঠাতে পারবেন না, তাই সেই বাণ দিয়ে তিনি পরশুরামের স্বর্গের পথ রুদ্ধ করে দেন। এই ঘটনার পর তাঁরা সবাই অযোধ্যায় পৌঁছলে শ্রীরামচন্দ্রের মাতা কৌশল্যা মহানন্দে তাঁর পুত্র এবং পুত্রবধূকে বরণ করে ঘরে তোলেন।

শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ‘শ্রীরামবিজয় নাট’ গ্রন্থে দেখা যায়, নারায়ণের রাম অবতারের শরীরী রূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে শ্রীরামচন্দ্র সগুণ সত্তায় তাঁর লীলা করেছেন। সগুণরূপে তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রের একজন আজ্ঞাপালনকারী শিষ্য, পিতার আজ্ঞাকারী পুত্র, ভ্রাতা লক্ষ্মণের রক্ষাকারী এবং আদরের বড় ভাই, স্ত্রী সীতার কাছে প্রেমিক এবং ভরসার স্বামী— ইত্যাদি বিভিন্নরূপে তিনি লীলা করেছেন। সগুণ সত্তায় তিনি নিজের ক্ষমতার উপর কখনও কখনও সন্দেহও করেছেন। যেমন তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, তিনি ‘মহেশক ধনু’তে গুণ যোজনা করতে পারবেন কিনা। আবার সেই শরীরী রূপের মধ্যে থেকেই নির্গুণরূপে ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ভগবানের শরণে এলে সবাই তাঁর আশীর্বাদ লাভ করতে সক্ষম হয়, একথার সত্যতা তিনি নিজের কার্যপ্রণালীর মাধ্যমে দেখিয়েছেন। যেমন, কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে কোনো ঋষির স্বর্গপথ রুদ্ধ করা সম্ভব নয়, নাটকে তিনি বাণ দিয়ে পরশুরামের স্বর্গপথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

ঋষি বিশ্বামিত্র: নাটকে দেখা যায়, ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর সিদ্ধাশ্রমে যজ্ঞ করছিলেন। সেখানে মারীচ এবং সুবাহু নামক দুজন রাক্ষস এসে তাঁর যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটায়। মূল রামায়ণে আছে, ঋষি বিশ্বামিত্র একটি যজ্ঞ করার জন্য দীক্ষিত হয়েছিলেন। বহুবীর্য চেষ্টা করেও তিনি তাঁর যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারেননি। বারে বারেই মারীচ এবং সুবাহু নামক দুই রাক্ষস এসে তাঁর যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটায়। তাই তিনি সেই যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারেননি।^{৩৯} নাটকে বার বার ঘটনাটি ঘটেছে, এমন উল্লেখ নেই। নাটকে বলা হয়েছে, মারীচ এবং সুবাহু নামক রাক্ষস দুজনের দ্বারা যজ্ঞে বাধা প্রাপ্ত হয়ে ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য অযোধ্যায় রাজা দশরথের কাছে যান। রাজা দশরথ তাঁর মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করবেন, একথা শুনে তিনি তাঁর পুত্র শ্রীরামচন্দ্র এবং

লক্ষ্মণকে তাঁর যজ্ঞ স্থলে নিয়ে আসতে চান। রাজা দশরথ ঋষি বিশ্বামিত্রের কথা শুনে তাঁর বালক পুত্রদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর আদরের পুত্রদের ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠাতে চাননি। তিনি নিজেই তাঁর সঙ্গে যেতে চেয়েছেন। তাতে ঋষি বিশ্বামিত্র খুব বেশি ক্রোধিত হন। তিনি রাজা দশরথকে বলেছেন, “অহে পাপী অসত্যবাদী! রাম লক্ষ্মণক নাহি পঠাবব।”^{৪০} সত্যপ্রিয় ঋষি বিশ্বামিত্রের মনে হয়েছে, একটু আগেই রাজা দশরথ তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে বলে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, তা ছিল মিথ্যা। তাই তিনি ক্রোধিত হন। ক্রোধ সম্বরণ করে তিনি রাজা দশরথকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, তিনি ধ্যানযোগে শ্রীরামচন্দ্রের ঐশ্বরিক ক্ষমতার বিষয়ে জানতে পেরেছেন। শ্রীরামচন্দ্র কোনো সাধারণ মানুষ নন, তিনি হলেন ঈশ্বর। শেষ পর্যন্ত প্রায় বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর পুত্রদের ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাঁর যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য পাঠান। নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করার পর ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁদের নিয়ে রাজা জনকের স্বয়ম্বর সভায় যান। সেখানে রাজা জনক খুব ভালো ভাবেই তাঁদের আদর-সৎকার করেছেন। সেই সভায় হরধনু ভঙ্গ করে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে জয় করেন। রাজা দশরথের উপস্থিতিতে শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতার বিয়ের পর তাঁদের নিয়ে ঋষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে শ্রীরামচন্দ্র পরশুরাম কর্তৃক আক্রান্ত হলে তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যকে রক্ষা করার জন্য পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধে ঋষি বিশ্বামিত্র পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।

মূল রামায়ণে বর্ণিত ঋষি বিশ্বামিত্রের শ্রীরামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে ‘বলা’ ও ‘অতিবলা’ বিদ্যাপ্রদান অথবা অঙ্গদান— ইত্যাদি বিষয়গুলো শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বর্জন করেছেন। আবার শ্রীরামচন্দ্র এবং পরশুরামের মধ্যে যুদ্ধের সময় ঋষি বিশ্বামিত্রের থাকার কথা মূল রামায়ণে বর্ণিত হয়নি, শঙ্করদেব নিজের মনের মত করে এই বিষয়টির উপস্থাপনা নাটকে করেছেন।

সীতা: নাটকের শুরুতে শ্রীমতী সীতা সম্পর্কে সূত্র সামাজিক লোকদের সম্বোধন করে বলেছে,

“সে জনক নন্দিনী সীতা, সখীসব সহিত নৃত্য করিয়ে— সে জাতিস্মর কন্যা, পূর্ব জন্মক কথা চিন্তে পরল তাহে সুমরি পরি ক্রন্দন কয় রহল। তাহে পেখি সখি মদনমন্তুরা সখী কনকাবতী বাহু মেলি ধরি পুচত।”^{৪১}

বুঝতে পারা যায়, ‘জাতিস্মর কন্যা’ এবং সীতার দুজন সখী রয়েছে। পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করে সীতা দুঃখিত। তাঁর মনে পড়েছে, পূর্ব জন্মে নারায়ণকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য তিনি তপস্যা করেছিলেন। সেই সময় তিনি আকাশবাণী শুনতে পেয়েছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি সখীদের বলেছেন,

“আহে সখীসব। হামু পূর্বব জনম ঈশ্বর নারায়ণক স্বামী ইচ্ছা কয়, অনেক জনম কায় ক্লেশ করিয়ে, বহুত বরিষ তপস্যা কয়লো। তদন্তর আকাশী বাণী শুনল: আহে কন্যা: তোহোঁ ওহি জনমে স্বামীক ভেট নাহি পাবব: আবব জনম: শ্রীরামরূপে তোহাক বিবাহ করাবব।”^{৪২}

বুঝতে পারা যায়, সেই আকাশবাণীর পর সীতার পরবর্তী জনমে শ্রীরামচন্দ্রকে স্বামীরূপে পাওয়ার জন্য দিন অতিবাহিত করছেন। স্বামী শ্রীরামচন্দ্রকে না পেয়ে অত্যন্ত কষ্টকর বিরহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তাঁর দিন কাটছে।

নাটকে রাজা জনক জানিয়েছেন, তিনি আকাশবাণী শুনেছিলেন, যে ‘মহেশক ধনু’তে গুণ দিতে পারবে, তাঁর সঙ্গেই সীতার বিবাহ হবে।^{৪৩} সেই মত রাজা জনক তাঁর কন্যার বিয়ের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে মিথিলার স্বয়ম্বর সভায় হরধনুতে গুণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আসেন। তাঁদের দেখে আনন্দের সঙ্গে রাজা জনকের রাজসভায় দুন্দুভি বাজানো হয়। অন্দরমহল থেকে সীতা সেই বাজনা শুনতে পান। তিনি তাঁর সখী কনকাবতীকে সেই বাজনা বাজানোর কারণ জেনে আসার জন্য পাঠান। কনকাবতী এসে সীতাকে বলে যে, এতদিন ধরে সীতা যাঁর প্রতীক্ষা করছেন, তিনিই এসেছেন।

সূত্রের মুখে শোনা যায়, সীতাকে বিভিন্ন ধরনের খুব সুন্দর বস্ত্র এবং অলঙ্কারে সাজিয়ে স্বয়ম্বর সভায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সীতাকে লাভ করার ইচ্ছে বুকে নিয়ে যে সমস্ত রাজারা এসেছিলেন, তারা সীতাকে দেখে কামুক হয়ে নানা ধরনের আজেবাজে মন্তব্য করছিলেন। তা দেখে সীতার সখীরা তাদের নাজেহাল অবস্থা করেছে। সূত্র আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, “জগতক মাতা জনকনন্দিনী তাহেক জানরে নাহি।”^{৪৪} অর্থাৎ, অন্তরে ভক্তি না থাকলে জগতমাতাকে চেনা যায় না।

মহেশক ধনুতে গুণ দিতে পারবেন কিনা— এই বিষয়ে শ্রীরামচন্দ্র নিজের উপর নিজেই সন্দেহ করেছিলেন। আবার সীতাও সন্দেহ করছিলেন, এই কঠিন কাজটি শ্রীরামচন্দ্র করতে পারবেন কিনা। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “হাঁ হাঁ হামার স্বামী পরম সুকুমার নরীন বয়স। বজ্রাধিক কঠিন মহেশক ধনু ইহাত গুণ দিতে স্বামী জানো নাহি পারয়।”^{৪৫} নাটকে সূত্রের মুখ থেকে জানা যায়, শ্রীরামচন্দ্র মহেশক ধনুতে গুণ দিতে পেরেছেন এবং সেই ধনুতে টঙ্কার দেওয়া মাত্রই ধনুকটি ভেঙে যায়। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতার শুভাকাঙ্ক্ষীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। সেই সঙ্গে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য রাজারা যারা শ্রীরামচন্দ্রের জন্য সীতা-প্রাপ্তির আশা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তারা শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে বিবাদ করতে এগিয়ে যায়। বালক শ্রীরামচন্দ্রের ক্ষমতা সম্পর্কে আবার সীতার মনে সন্দেহ জাগে, শ্রীরামচন্দ্র সেই রাজাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন কিনা। শ্রীরামচন্দ্রের সম্পর্কে চিন্তায় সীতা বিধিকে স্মরণ করে বিলাপ করছেন। এই সম্পর্কে নাটকে তিনি বলেছেন,

“হা হা বিধি! হামার কি কপাল মিলল। হরি হরি রাম সুকুমার। নরীন বয়স। সঙ্গে সোদর মাত্র সহায়। ওহি পরম নিকরুণ দারুণ রাজাসবক কৈছে যুদ্ধে জিনব। হা হা বিধি কোন অপরাধে হামাক বঞ্চল।”^{৪৬}

তবে, শ্রীরামচন্দ্র সীতার মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছেন। তিনি সীতাকে সাহুনা দিয়ে বলেছেন যে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। সীতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন কৌতুক দেখেন। সেই যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্র কারো কান, কারো নাক কেটে দিয়ে সত্যি সত্যিই সীতাকে কৌতুক দেখিয়েছিলেন। বিয়ের পর অযোধ্যা ফেরার পথে পরশুরাম কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্র আক্রান্ত হলে সীতা যমরূপী পরশুরামকে দেখে আবার বিধিকে স্মরণ করে বিলাপ করতে শুরু করেন। শ্রীরামচন্দ্র আবার তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে, তিনি এখন চলেছেন পরশুরামের দর্প চূর্ণ করতে। সীতা যেন সেই কৌতুক দর্শন করেন। এই যুদ্ধের শেষেও পরশুরাম পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছেন। তারপর তিনি স্বামী এবং শ্বশুরের সঙ্গে শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। তাঁর শাশুড়ি মাতা তাঁকে বরণ করে ঘরে তোলেন। সখীদের সঙ্গে সীতা, নারায়ণকে স্বামীরূপে লাভ করার জন্য সীতার তপস্যা, স্বামীরূপে লাভ করার পর স্বয়ম্বর সভায় অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে অথবা পরশুরামের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের সম্পর্কে সীতার চিন্তা— ইত্যাদি বিষয়গুলি মূল রামায়ণের আদিকাণ্ডে অনুপস্থিত।

দশরথ: নাটকে দেখা যায়, অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তিনি মুনি-ঋষিদের যথেষ্ট সম্মান করতেন। ঋষিদের আজ্ঞা পালন তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। ঋষি বিশ্বামিত্র যখন তাঁর সভায় পদার্পণ করেন, তখন তিনি খুব আনন্দিত এবং আহ্লাদিত হন। তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রকে বলেছেন,

“হে মুনিরাজ! তোহারি পদ পরশে হামার অযোধ্যাপুরী পবিত্র ভেল।..... মুনি অব কোন প্রয়োজন সাধো, হামাক আজ্ঞা করহ। সভামধ্যে অঙ্গীকার কয়লো, আজু যে দান মাগহ, তাহেক সত্যে সত্যে দেবব।”^{৪৭}

রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন স্নেহপ্রবণ পিতাও। তাই, যখন তিনি জানতে পারলেন ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর পুত্রদের মারীচ এবং সুবাহু নামক দুই শক্তিশালী রাক্ষসদের দমন করার জন্য নিয়ে যেতে

এসেছেন। তখন পিতা দশরথের মন তাঁর বালক পুত্রদের নিরাপত্তার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তিনি জানতেন, মারীচ এবং সুবাহু খুব শক্তিশালী যোদ্ধা। তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রকে অনুরোধ করেছেন, পুত্রদের স্থানে তিনি যেন তাঁর সঙ্গে দশরথকে নিয়ে যান। এই সম্পর্কে তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রকে বলেছেন,

“আহে মুনিরাজ! হামার পুত্র রাম লক্ষ্মণ, সে বালক। তাহেক রাক্ষসক দিতে চাব। শুনি কোন ব্যবহার। হা হা হে ঋষিরাজ। যজ্ঞ রক্ষা নিমিত্ত হামাক নিয়া যাব।”^{৪৮}

তাঁর কথায় ঋষি বিশ্বামিত্র ক্রোধিত হন। তিনি তাঁকে ‘পাপী’, ‘অসত্যবাদী’ ইত্যাদি বলে সম্বোধন করেন। রাজা হয়েও পুত্রদের হিতার্থে তিনি ঋষি বিশ্বামিত্রের পা ধরে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছেন। তিনি বারে বারে ঋষি বিশ্বামিত্রকে বলেছেন, পুত্রদের স্থানে তাঁকে নিয়ে যেতে। রাজা দশরথ তাঁর ছেলেদের ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠাতে রাজি হচ্ছিলেন না। তখন ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র কোনো সাধারণ মানুষ নন, তিনি নারায়ণের অবতার। তিনি অসুর, রাক্ষস সবগুলোকে বধ করে পৃথিবীর ভার হরণ করবেন। শেষ পর্যন্ত প্রায় বাধ্য হয়ে রাজা দশরথ তাঁর আদরের ছেলেদের ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠাতে সম্মত হন। বেশ কিছুদিন তাঁর আর পুত্রদের দেখা হয়নি। তাড়কা রাক্ষসী, মারীচ এবং সুবাহুকে বধ করে শ্রীরামচন্দ্র ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যখন মিথলায় রাজা জনকের কন্যা সীতার বিবাহের জন্য আয়োজিত স্বয়ম্বর সভায় গিয়ে ‘মহেশক ধনু’তে গুণ যোজনা করে সীতাকে জয় করতে সক্ষম হন, তখন রাজা জনকের আমন্ত্রণে রাজা দশরথ মিথলায় আসেন। নাট্যকার শ্রীমন্ত শঙ্করদেব নাটকে সূত্রের মুখে একথা জানিয়েছেন। তিনি রাজা জনকের কন্যা সীতার সঙ্গে তাঁর পুত্র শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহের প্রসঙ্গে খুবই আনন্দিত হন। পিত্রালয় থেকে সীতার বিদায় হওয়ার পর পথে পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের পথরোধ করেন। পিতার মন আবার তাঁর পুত্রের ক্ষতির আশঙ্কায় কেঁপে উঠে। তিনি হাতে পায়ে ধরে, ক্ষমা চেয়ে পরশুরামকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেছেন। নাটকে তিনি পরশুরামকে বলেছেন,

“হে পরশুরাম প্রভু! হামার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র বালক মতি।..... তোহারি চরণক দাস ভেলো।..... হামাক পুত্র দান দেহু। যব নাহি ক্ষমা করব তব পুত্রক ছোড়ি মোর প্রাণ লেহু।..... হে ঋষিরাজ, হামাক পুত্র-দান দেহ। তোহারি পাবৰে লাগু।”^{৪৯}

তিনি অযোধ্যার রাজা হয়েও তাঁর আদরের পুত্রের প্রাণ রক্ষা করার জন্য বারে বারে পরশুরামের পায়ে পড়ে অনুরোধ জানিয়েছেন। সব পিতার মত তিনিও চাননি, তাঁর আদরের পুত্রের কোনো ক্ষতি হোক। অযোধ্যার রাজা হওয়ার সাথে সাথে তিনি একজন স্নেহপ্রবণ পিতা।

পরশুরাম: নাটকে পরশুরাম খুব স্বল্প পরিসরে বর্ণিত হয়েছেন। হরধনু ভঙ্গকারীকে নিজের শাস্তি দেবেন বলে কুঠার হাতে নিয়ে তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পথ অবরোধ করেছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়দের এবং তাঁর মাতা রেণুকাকে বধ করেছেন বলে তাঁর দর্প ছিল। সেখানে তিনি শক্তিশালী বিশ্বামিত্রকে যুদ্ধে হারিয়েছেন। শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর দর্প হরণ করেছেন। নারায়ণের অবতার এযুগের ঈশ্বর শ্রীরামচন্দ্রকে চিনতে পেরেছেন তিনি। তাই তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। মূল রামায়ণে বর্ণিত বৈষ্ণব ধনুর কথা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বর্জন করেছেন।

সীতার সখীরা: নাটকের শুরুতেই সীতাকে তাঁর সখীদের সঙ্গে দেখা যায়। সীতার সখীরা হল, মদনমন্তরা, কনকাবতী, চন্দ্রমতী এবং সূর্যপ্রভা। বলা বাহুল্য, এই সখীদের মূল রামায়ণে দেখা যায় না। নাটকে সীতার মনের অবস্থা বোঝাতে, আবার বেশ কিছু স্থানে নাটকের কাহিনির অগ্রগতিতে এদের ভূমিকা রয়েছে। আবার শ্রীরামচন্দ্র যে নারায়ণের অবতার ঈশ্বর— নাটকে তাদের মুখেও একথার সমর্থন লক্ষ করা যায়। সীতার মনের কথা খুলে বলার মত চরিত্র নাটকে অনুপস্থিত। তাই শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সীতার কয়েকজন সখী চরিত্র

সৃষ্টি করেছেন। বিরহিণী সীতা শ্রীরামচন্দ্রের বিষয়ে যে চিন্তা-ভাবনা করছেন, সীতার মনের সেই কথাগুলো তাদের মাধ্যমে নাট্যকার নাটকে প্রকাশ করেছেন। আবার নাটকের অন্যান্য চরিত্রের মত সীতার সখীরাও শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের নাটক রচনার উদ্দেশ্য সফল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সীতার সখী কনকাবতীর মুখে শোনা যায়, শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণের অবতার ঈশ্বর। এই সম্পর্কে সে সীতাকে বলেছে,

“আহে সখী যৈচন মহাপুরুষ লক্ষণ দেখল, হামু জানল, ওহি ঈশ্বর নারায়ণ, শ্রীরামরূপে তোহার বিবাহ হেতু আবল। ইহাত কিছু শঙ্কা নাহি করবি!”^{৫০}

সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক হলেও শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সৃষ্ট এই চরিত্রগুলোর মানবিক আবেদন অস্বীকার করা যায় না।

উপস্থাপনা: মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ভক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই সূত্রে শুধুমাত্র তাঁর নববৈষ্ণব ধর্মের প্রচারের জন্যই তিনি কলম ধরেছিলেন। ‘শ্রীরামবিজয় নাট’ গ্রন্থটি এই উদ্দেশ্যেই তিনি রচনা করেছিলেন। এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক নাটক। নাটকটিতে কোনো অঙ্কবিভাগ নেই। ‘নমো ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণায়’ বলে তিনি নাটকটি শুরু করেছেন। এই নাটকের প্রধান ঘটনাটি ছিল শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ উৎসব। স্বয়ম্বর প্রথা অনুসারে শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতার বিয়ে হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র বিন্দুতে রেখে আরও কিছু ছোট ছোট ঘটনার বর্ণনা করেছেন শ্রীমন্ত শঙ্করদেব। ঘটনা যেমনই হোক না কেন, শ্রীরামচন্দ্রের ঈশ্বর রূপের অর্থাৎ হরিকে প্রতিষ্ঠা করা ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। নাটকের এই উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য তিনি নাটকে অনেকগুলি গানেরও ব্যবহার করেছেন। যেমন,— সিদ্ধুরা রাগের গান—

“ভেলি পরবেশ পরমেশ রঘুনাথে।

সঙ্গে সোদর শর ধনু হাতে।।

শ্যাম রুচির চির পীত পরকাশ।

পঙ্কজ নয়ন বয়ন মন্দ হাস।।”^{৫১}— ইত্যাদি।

এছাড়াও নাট্যকারের অভিপ্রেত প্রকাশে সংস্কৃত শ্লোক, ‘ভটিমা’ এবং ‘সূত্রে’র ভূমিকাও রয়েছে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাটকে দেখা যায়, তা হল— বার বার মন্ত্রের মত উচ্চারিত একটি পঙক্তি। পঙক্তিটি হল,— “নিরন্তর হরি হরি বোল।” বুঝতে পারা যায়, এই হরিনামের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের আসল উদ্দেশ্য।

নাটকে বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

ক) নাটকের শুরুতেই সূত্র সীতা সম্পর্কে জানিয়েছে, সীতা জাতিস্মর। অর্থাৎ, সীতা পূর্ব জন্মের কথা বলতে পারেন।^{৫২}

খ) সীতা তাঁর বিয়ের বিষয়ে আকাশবাণী শুনতে পেয়েছিলেন।^{৫৩} পরবর্তী জন্মে সেই ঘটনাটি ঘটেছে।

গ) সীতার পিতা রাজা জনকও বলেছেন যে, হরধনুতে যে গুণ দিতে পারবে, তাঁর সঙ্গে সীতার বিয়ে হবে। এই বিষয়ে তিনি আকাশবাণী শুনতে পেয়েছিলেন।^{৫৪} মূল রামায়ণে এই বিষয়ে কোনো আকাশবাণীর কথা বর্ণিত হয়নি।

ঘ) ধনুকে শর সন্ধান করে কোনো ব্যক্তির জন্য স্বর্গপথ রুদ্ধ করা যায় না। নাটকে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্র ধনুকে শর সন্ধান করে ঋষি পরশুরামের স্বর্গপথ রুদ্ধ করেছেন।^{৫৫}— ইত্যাদি।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপট:

ক) ভক্তি আন্দোলন ও মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব: আসামে ভক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব (১৪৪৯-১৫৬৮)। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে আসামের অবস্থা শোচনীয় ছিল। সেই সময় আসামে

বিভিন্ন ধরনের ধর্মের প্রচলন ছিল। তন্ত্রপ্রধান শৈবধর্ম, শাক্তধর্ম, নাথধর্ম, বৌদ্ধধর্ম— ইত্যাদি। এই সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন,

“শঙ্করদেবের পূর্বে আসামে নানা ধর্ম প্রচলিত ছিল।— ক) শৈব ধর্ম; খ) শাক্তধর্ম; গ) তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্ম; ঘ) বজ্রযানী বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম; ঙ) নাথধর্ম। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সব কটি ধর্মের মূলে রহিয়াছে তন্ত্র।”^{৫৬}

এমনকি মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের পূর্বপুরুষও শাক্তধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ধীরে তন্ত্রপ্রধান ধর্মের মোড়কে সমাজে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের ব্যভিচার, অসাধু কর্ম, অনৈতিকতা। সমাজ অবনতির দিকে অগ্রতিহতভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব এই সমাজকে শোধরানোর কাজে ব্রতী হন। আসামে তিনি গড়ে তুলেছিলেন বৈষ্ণব আন্দোলন। এই সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন,

“তন্ত্রধর্মে নানা ব্যভিচার, অভিচারাদির প্রবেশ করিয়া ধর্মের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছিল। মুক্তির সহজ পন্থা হিসাবে নরবলি, নানা অভিচার ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হইত। ধর্মের নামে নৈতিক অবনতি, সামাজিক দুর্নীতি প্রভৃতি নানা দোষ অসমীয়া সমাজকে কলুষিত করিয়াছিল। ইহারই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ শঙ্করদেবের বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলন। তিনিই অসমীয়া জনগণের ধর্মধারণায় পরিবর্তন আনিয়াছিলেন।”^{৫৭}

খ) নববৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব: মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মকে নববৈষ্ণব বলা হয়। তিনি একশরণ ভাগবতী বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের মনকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলার জন্য তিনি সংস্কৃত মূল ভাগবতের অসমীয়া ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। এছাড়াও তিনি সংস্কৃত পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি,— যেখানে শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল মহিমা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে— সেই বিষয়গুলিকে নতুন রূপে উপস্থাপন করেছিলেন। একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি রচনা করেছিলেন— ‘শ্রীরামবিজয় নাট’ নামক তাঁর বিখ্যাত ‘অঙ্কীয়া নাটক’টি।

গ) ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ: নাটকে দেখা যায়, রাজা ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পালন করতে এক ধরনের বাধ্য। রাজা দশরথ একান্ত অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও একেবারে বাধ্য হয়ে তাঁর আদরের বালক পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তাঁর যজ্ঞ রক্ষা করতে পাঠিয়েছেন। আবার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ অপরাধ করলে তাঁকে শাস্তিও পেতে হয়। যেমন, শ্রীরামচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করে পরশুরামের স্বর্গ পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন।

ঘ) বিয়ের বয়স এবং বিবাহ পদ্ধতি: মূল রামায়ণে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল ১৩ বছর বয়সে, তখন তাঁর পত্নী সীতার বয়স ছিল, ৬ বছর।^{৫৮} নাটকে শ্রীরামচন্দ্রকে ‘বালক’ বলা হয়েছে। সীতা হলেন বয়সে ‘নবীন’। হিন্দু সমাজে যেমন পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বর এবং কন্যার বিবাহ স্থির করেন। পরিবারের বড়দের উপস্থিতিতে বরমাল্যের মাধ্যমে নরনারীর মধ্যে বিবাহ সংগঠিত হয়। বিয়ের পর নববধূ বর এবং বরযাত্রীদের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ি যায়। শ্বশুর বাড়িতে বরের মা তাঁর পুত্র এবং পুত্র বধূকে বরণ করেন।— ‘শ্রীরামবিজয় নাট’ গ্রন্থেও দেখা যায়, স্বয়ম্বর সভার মাধ্যমে শ্রীমতী সীতা কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে বর নির্বাচন করার পর বড়দের উপস্থিতিতে বিভিন্ন নিয়ম নীতির মাধ্যমে রাম এবং সীতার মধ্যে বিবাহ সংগঠিত হয়েছে। পুত্র রাম এবং নববধূ সীতাকে মাতা কৌশল্যা বরণ করে ঘরে তুলেছেন।

উপসংহার:

আলোচনা শেষ করার পূর্বে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির দিকে খুব সংক্ষেপে আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল,—
মূল রামায়ণে দেখা যায়—

ক) রামায়ণে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের বিয়ে হয়েছিল তেরো বছর বয়সে এবং বিয়ের সময় সীতার বয়স ছিল ছয়।

খ) রামায়ণে তাড়কা রাক্ষসীর জন্ম বৃত্তান্তের দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে।

গ) রামায়ণে মহারাজা জনক তাঁর কন্যা সীতার বিয়ের জন্য কোনো ধরনের স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেননি।

ঙ) মূল রামায়ণে আছে, শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অপর তিন ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে। মাতা কৌশল্যা, মাতা কৈকেয়ী, মাতা সুমিত্রা তিনজন মাতা মিলে একসঙ্গে তাঁদের চার জন পুত্র এবং পুত্র বধূদের বরণ করে ঘরে তুলেছেন।

চ) রামায়ণে দেখা যায়, পরশুরামের হাতের অস্ত্র ছিল বৈষ্ণব ধনুক।

ছ) রামায়ণে পরশুরামের মুখে শোনা যায়, শ্রীরামচন্দ্র হলেন শ্রীমধুসূদন।

‘শ্রীরামবিজয় নাট’ গ্রন্থে দেখা যায়—

ক) নাটকে শ্রীরামচন্দ্রের সগুণ এবং নির্গুণ দুটো সত্তার বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

খ) নাটকে সূত্রের মুখে জানা যায়, শ্রীরামচন্দ্র নারায়ণের অবতার ঈশ্বর। ভূভার হরণের জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। সীতা হলেন জগত মাতা।

গ) নাটকের প্রতিটি চরিত্র প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জানতে পেরেছেন নারায়ণের অবতার শ্রীরামচন্দ্র হলেন ঈশ্বর। যেমন— দশরথ জানতে পেরেছেন ঋষি বিশ্বামিত্রের মুখ থেকে।

ঘ) নাটকে শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতার বিয়ের বয়সের উল্লেখ নেই। রাম বালক এবং সীতা নবীনা কন্যা।

ঙ) সীতা জাতিস্মর।

চ) শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের ‘শ্রীরামবিজয় নাট’ গ্রন্থের তাড়কা রাক্ষসীর বধ অংশটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

ছ) মূল রামায়ণে সীতার সখীদের কথা বর্ণিত হয়নি।

য) পরশুরামের যুদ্ধের অস্ত্র হল, কুঠার।

ঝ) ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রাহ্মণ অপরাধী হলে তাকেও দণ্ড দেওয়া যায়। পরশুরাম নিজের কৃত কর্মের শাস্তি পেয়েছেন।

ঞ) স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত অন্যান্য রাজাদের নিম্নমানের চরিত্রের বর্ণনাও একান্তভাবে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের নিজস্ব সৃষ্টি। মূল রামায়ণে এই বিষয়টি আলোচিত হয়নি।

ট) নাটকটিতে বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনা সন্নিবিষ্ট হলেও নাটকটি তার অবাস্তব হয়ে উঠেনি।

ঠ) রাজা দশরথ এবং সীতা শ্রীরামচন্দ্র ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী জানার পরেও শ্রীরামচন্দ্র সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে থাকতে পারেননি। যখনই তাঁরা দেখেছেন, শ্রীরামচন্দ্রের উপর কোনো ধরনের বিপদ আসতে চলেছে, শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে তাঁদের মন চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

ড) ঋষি বশিষ্ঠের প্রসঙ্গ মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বর্জন করেছেন।

ঢ) রাজা জনক আকাশবাণী শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, যে ব্যক্তি মহেশ্বক ধনুতে গুণ দিতে পারবে, তার হাতেই তিনি তাঁর কন্যা সীতাকে অর্পণ করবেন।

রামায়ণ থেকে উপকরণ গ্রহণ করলেও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের 'শ্রীরামবিজয় নাট' গ্রন্থটি একটি নতুন সৃষ্টি। ভক্তি আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি নাটকটি রচনা করেছেন যদিও, তথাপি কাল্পনিক ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি, উৎকৃষ্ট উপস্থাপনাগুণে নাটকটি একটি সার্থক নাটক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে শ্রীরামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা এবং পিতা দশরথ ঈশ্বরের আত্মীয় হওয়ার পরও সুখ-দুঃখে জর্জরিত খাঁটি রক্তমাংসের মানুষ হয়ে উঠেছেন।— ইত্যাদি কারণে বলা যায়, ষোড়শ শতকে রচিত হলেও বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটেও নাটকটি প্রশংসার দাবি রাখে।

তথ্যসূত্র:

১. বাল্মীকি রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ২০/১৬-১৯
২. তদেব, ১৯/৪-৬
৩. তদেব, ১৯/১৮
৪. তদেব, ২০/২
৫. তদেব, ২০/৭-৮
৬. তদেব, ২০/১৪
৭. তদেব, ২০/২৮
৮. তদেব, ২১/২২
৯. তদেব, ২২/২১-২২
১০. তদেব, ২৪/ ৩০-৩২
১১. তদেব, ২৬/২৫-২৬
১২. তদেব, ২৭/২৩-২৮ এবং ২৮/৩-১০
১৩. তদেব, ২৮/২০-২২
১৪. তদেব, ২৯/২৭
১৫. তদেব, ৩০/১৭-১৮
১৬. তদেব, ৩০/২২-২৩
১৭. তদেব, ৩১/৩-৫
১৮. তদেব, ৬৫/৩২-৩৩
১৯. তদেব, ৬৬/৫-৬
২০. তদেব, ৬৬/১৪-২৬
২১. তদেব, ৬৬/১৬-১৭
২২. তদেব, ৬৮/৬-১০
২৩. তদেব, ৭১/৭
২৪. তদেব, ৭৩/২৬-৩৪
২৫. তদেব, ৭৪/১
২৬. তদেব, ৭৫/২৮
২৭. তদেব, ৭৬/১১-১৭
২৮. তদেব, ৭৬/২২

২৯. তদেব, ৭৭/১০-১২
৩০. 'শ্রীরামবিজয় নাট', 'শঙ্করদেবের নাট', মহিম বরা সম্পাদিত, পৃ. ২৪৩।
৩১. তদেব, পৃ. ২৪৭।
৩২. 'শিবপুরাণম্' / 'জ্ঞান সংহিতা' / দ্বাদশ অধ্যায়।
৩৩. 'শ্রীরামবিজয় নাট', 'শঙ্করদেবের নাট', মহিম বরা সম্পাদিত, পৃ. ২৫৮-২৫৯।
৩৪. তদেব, পৃ. ২৫৯।
৩৫. তদেব, পৃ. ২৬০-২৬১।
৩৬. তদেব, পৃ. ২৬১।
৩৭. তদেব, পৃ. ২৬৫।
৩৮. তদেব, পৃ. ২৬৭।
৩৯. বাল্মীকি রামায়ণ, ১৯/৪-৬।
৪০. 'শ্রীরামবিজয় নাট', 'শঙ্করদেবের নাট', মহিম বরা সম্পাদিত, পৃ. ২৪৪।
৪১. তদেব, পৃ. ২৩৯-২৪০।
৪২. তদেব, পৃ. ২৪০।
৪৩. তদেব, পৃ. ২৫৭।
৪৪. তদেব, পৃ. ২৫৬।
৪৫. তদেব, পৃ. ২৫৮।
৪৬. তদেব, পৃ. ২৬০।
৪৭. তদেব, পৃ. ২৪৩।
৪৮. তদেব, পৃ. ২৪৩।
৪৯. তদেব, পৃ. ২৬৪।
৫০. তদেব, পৃ. ২৫৩।
৫১. তদেব, পৃ. ২৩৮।
৫২. তদেব, পৃ. ২৪০।
৫৩. তদেব, পৃ. ২৪০।
৫৪. তদেব, পৃ. ২৫৭।
৫৫. তদেব, পৃ. ২৬৮।
৫৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা। 'পূর্ব ভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য'। পৃ. ৯।
৫৭. তদেব, পৃ. ১১
৫৮. চক্রবর্তী, বিষ্ণুপদ। 'রামায়ণ চরিতমালা'। পৃ. ৫৭৯।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. তর্কাচার্য, মহামহোপাধ্যায় কালীপদ ও শ্রীশ্রীজীব ভট্টাচার্য ন্যায়তীর্থ (সম্পূজক)। 'শ্রীমদবাল্মীকীয় রামায়ণ'। আদিকাণ্ড, ১ম অধ্যায় থেকে ২৭ নং অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা ১৬ পর্যন্ত, শ্রীশ্রী সীতারামদাসওঙ্কার নাথ প্রবর্তিত 'আর্য শাস্ত্র', দ্বিতীয় বর্ষ, পৌষ, সপ্তম সংখ্যা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা।

২. তর্কাচার্য, মহামহোপাধ্যায় কালীপদ ও শ্রীশ্রীজীব ভট্টাচার্য ন্যায়তীর্থ (সম্পূজক)। 'শ্রীমদবাল্মীকীয় রামায়ণ'। আদিকাণ্ড, ২৭ নং অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা ১৬ থেকে আদিকাণ্ড সমাপ্তি পর্যন্ত, শ্রীশ্রী সীতারামদাসওঙ্কার নাথ প্রবর্তিত 'আর্য শাস্ত্র', দ্বিতীয় বর্ষ, মাঘ, অষ্টম সংখ্যা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, কলকাতা
৩. বরা, মহিম (সম্পা.)। 'শঙ্করদেবর নাট'। ১৯৮৯, অসম প্রকাশন পরিষদ, গুৱাহাটী, অসম।
৪. তর্করত্ন, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত (সম্পা.)। 'শিবপুরাণম্', শ্রীমন্মহাষিকৃষ্ণদ্বৈপায়ন -বেদব্যাস-প্রণীতম্। ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেসিন যন্ত্রে শ্রীনটবর চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরাধা। 'পূর্ব ভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য'। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ, জি. এ. ই. পাবলিশার্স, কলকাতা।
৬. চক্রবর্তী, বিষ্ণুপদ। 'রামায়ণ চরিতমালা'। ২০১২, আনন্দ পাবলিশার, কলকাতা।